স্মৃতি-সুধা

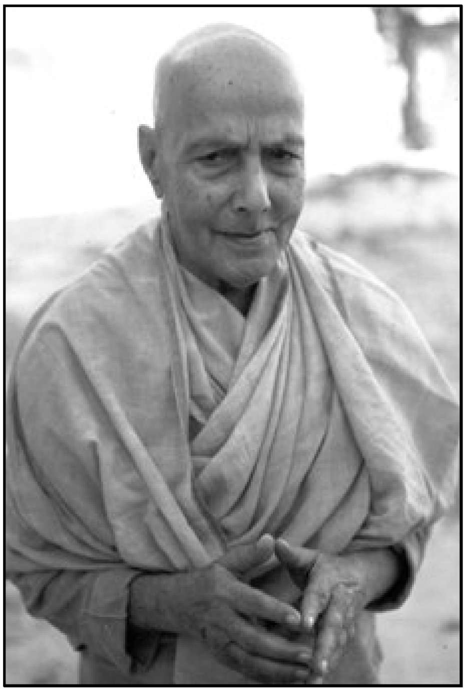

সাধুসঙ্গ ঃ স্মৃতিরত্নমালা

স্বামী শুক্লাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধুনা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জয়রামবাটী ও কলকাতায় শ্রীমা সারদাদেবীর চরণপ্রান্তে ছুটে এসেছিলেন তাঁর অনেক ত্যাগী সন্তান ও গৃহী শিষ্য। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজ। তাঁর পূর্বনাম গোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীহট্টের দুলালী পরগনার দাসপাড়া গ্রামে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যুবক অবস্থায় তাঁর সঙ্গে স্বনামধন্য ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্যের (পরবর্তী কালে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ) সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর মাধ্যমে পূজনীয় গোপেশ মহারাজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শ ও রামকৃষ্ণ সংঘ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অবস্থিত বাগবাজারের মায়ের বাড়িতে (উদ্বোধনে) শ্রীমাকে দর্শন করতে তিনি শ্রীহট্ট থেকে কলকাতায় আসেন। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে থাকায় তাঁর পক্ষে শ্রীমাকে দর্শন করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জয়রামবাটীতে যান এবং সেখানে প্রথম শ্রীমায়ের দর্শনলাভে ধন্য হন। প্রথম দর্শনের দিনেই শ্রীমা তাঁকে দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য ব্রত দিয়ে কৃতার্থ করেন। ঐসময় কয়েক বছর তিনি শ্রীমায়ের সেবা করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে পূজনীয় গোপেশ মহারাজ রামকৃষ্ণ সংঘের জয়রামবাটী কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী কেন্দ্রের কর্মিরূপে প্রেরিত হন। ঢাকা, বেঙ্গালুরু আশ্রমে কর্মী হিসাবে থাকা ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কাছাড়, মনসাদ্বীপ, হিঙ্গালগঞ্জ এবং চেন্নাইয়ে বড় বড় ত্রাণকার্যে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তপস্যায় অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত পূজনীয় গোপেশ মহারাজ বৃন্দাবন সেবাশ্রমে অবসরজীবন যাপন করেছিলেন। শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের অনুরোধে শুধুমাত্র ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র একবছরের জন্য তিনি ত্রিপুরার অন্তর্গত আগরতলা আশ্রমে অবস্থান করেন। তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' ও 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থদ্বয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্যের পরিসরে অমূল্য সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর বৃন্দাবন সেবাশ্রমে তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁর নশ্বর দেহ পবিত্র যমুনায় সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

পূজনীয় গোপেশ মহারাজের জীবনে প্রখর বাস্তবজ্ঞানের সঙ্গে চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতির যথার্থ সমন্বয় ঘটেছিল। সেজন্য তিনি বহু সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তের জীবনের পথপ্রদর্শক ও বন্ধু হয়েছিলেন। সাধনজীবনের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর সরল ও কঠোর জীবনযাপন এবং নিঃস্বার্থ স্নেহ-ভালবাসা প্রবীণ ও নবীন সকলকেই আকর্ষণ করত। মধুর স্বভাব ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টিবি স্যানেটোরিয়ামের বর্তমান সন্ন্যাসী-কর্মী স্বামী শুক্লাত্মানন্দ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর বৃন্দাবন সেবাশ্রমে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। সেই অমূল্য ও আনন্দঘন অভিজ্ঞতা 'সাধুসঙ্গ ঃ স্মৃতিরত্নমালা' শিরোনামে 'উদ্বোধন' পত্রিকার পাঠকবর্গকে তিনি উপহার দিয়েছেন। এই অপূর্ব রচনাটি আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে পেরে গভীর আনন্দ বোধ করছি।—**সম্পাদক**

গোপেশ মহারাজ এত সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর পরনের জামাকাপড় ছিল নিতান্ত সাদাসিধে এবং তা যৎসামান্যই—নেহাত যা না হলে চলে না। জামা ব্যবহার করতে দেখিনি, ফতুয়া ছিল—বোতাম ছাড়া, মাথা গলিয়ে পরতেন। তাও বছরে হয়তো ২-৩ মাস। গেঞ্জি, চাদর, বহির্বাস, টুপি ইত্যাদি সবই ছিল পুরনো, এখানে ওখানে সেলাই করা। একবার পুরনো গেঞ্জি কেটে হাতে সেলাই করে একটি টুপি করে দিয়েছিলাম। তাতে তিনি ভারী খুশি। এরপর থেকে অল্প শীতে ঐ হাতে তৈরি করা ছেঁড়া গেঞ্জির টুপিই পরতেন। নতুন কেনা গেঞ্জির টুপি কিছুতেই পরতেন না, বলতেন ঃ "ও চেপে ধরে, একটু পরেই মাথা কনকন করবে।" আমি ধীরে ধীরে পুরনো কাপড় ইত্যাদি পালটে সব নতুন করেছিলাম। প্রথম প্রথম এসব ব্যাপারে খুব নজর রাখতেন এবং এজন্য আমায় অনেক বকুনি খেতে হয়েছে। শেষে ওসব বিষয়ে আর কখনো কিছুই বলতেন না। নিজে

পুরো ধুতি কখনো পরতেন না, ধুতিটি অর্ধেক করে পরতেন, তাও আবার হাঁটু পর্যন্ত।

একবার মহারাজের কাছে বেশ কয়েকখানা ভাল ধুতি জমা হওয়ায় আমি তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বলি ঃ "মহারাজ, কদিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা আসছে। এখানে বেশ কয়েকখানা ধুতি জমেছে। আপনি মায়ের দীক্ষিত সন্তান। তিথিপূজার দিনে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সকলকে একখানা করে দিলে সকলেই খুব খুশি হবেন।" মহারাজ শুনে মুচকি হেসে বললেন ঃ "হ্যাঁ, তাই দেব, তবে তার আগে সকলকে বলব যার যত অতিরিক্ত কাপড় আছে, সব আমার কাছে জমা রাখতে। যখন যার প্রয়োজন হবে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। আমি জানি, প্রত্যেকের কাছে প্রয়োজনের বেশি কাপড় আছে।" জামাকাপড় পরিপাটি করে ভাঁজ করা, তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। আমার বরাবরের অভ্যাস জিনিসপত্র, জামাকাপড় খুব পরিপাটি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। এজন্য আমায় একবার তিরস্কার করে বলেন ঃ "যাও না সাজ-গোজ করে থাকবে, সাধু হতে এসেছ কেন? জান, সাধু শ্মশানের পরিত্যক্ত কাপড় পরবে।"

মহারাজের জামাকাপড় বলতে দুখানা করে ফতুয়া, গেঞ্জি, বহির্বাস (অর্ধেক ধুতি), একখানা উত্তরীয় ও দুখানা ডোর-কৌপিন। এছাড়া বহু পুরনো সামান্য কিছু গরম কাপড়। এই ছিল তাঁর পরিধেয় বস্ত্রাদি। ঘরের বাইরে বের হলে সবসময় উত্তরীয় সঙ্গে নিতেন। সাধারণত উত্তরীয় খুলে গায়ে দিতেন। বলতেন ঃ "সাধুর উত্তরীয় না থাকলে গুণ্ডা গুণ্ডা লাগে।" কখনো নতুন কাপড়-গেঞ্জি ইত্যাদি কিছু পরলে সেটা পরে প্রথমেই গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করতেন, গরম কাপড় যৎসামান্য যাকিছু ছিল তা রাখার জন্য বাক্স-ব্যাগ কিছুই ছিল না। পুরনো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পুঁটলি বেঁধে রাখতেন। উত্তরাখণ্ডে সাধুরা কীভাবে পুঁটলি বাঁধেন তা নিজে হাতে করে আমায় দেখিয়েছেন। ধোয়ার পর ভেজা কাপড় কীভাবে শুকোতে দিতে হয়, তাও। "আরে আহাম্মক, ওভাবে নয়, এভাবে কাপড় শুকোতে দিতে হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি শুকোবে"—এই বলে নিজে দেখিয়ে দিতেন। কাপড় শুকিয়ে গেলে বেশিক্ষণ রোদে পড়ে থাকা বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাপড় সাবান-জলে ভিজিয়ে রাখাও পছন্দ করতেন না। মহারাজের কাপড়-চোপড় অতি সামান্যই ছিল। সেসব রাখার জন্য কোন সুটকেস তো দূরের কথা সাধারণ ব্যাগ বা বাক্সও ছিল না। স্বামী স্বাহানন্দজী একদিন মজা করে মহারাজকে বলেন ঃ "ও যে সেবা করছে আপনার, একটা বাক্স-প্যাঁটরাও নেই যে ও তা পাবে—অপরকে দেখাবে মহারাজের কাছে পেয়েছি বলে।" মহারাজের ব্যবহারের জিনিস বেশির ভাগই এমন ছিল যে, রাস্তায় পড়ে থাকলেও সেসব কেউ নেবে না।

মহারাজ তাঁর কঠোর ত্যাগ-বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনের প্রতিটি কর্মই অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে করতেন। সেইজন্যই মহাপুরুষ মহারাজ একবার তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন ঃ "ওঃ গোপেশ করবে! ও তো সবই ভেবে-চিন্তে কাজ করে।" তিনি কখনো অসাধুজনোচিত কোন কিছুর সঙ্গে compromise করতেন না—এমনকী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের অনুরোধেও নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর কঠোর বৈরাগী শিষ্য রঘুনাথকে পুরীধামে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ "গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥/ অমানী মানদ, কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥" এই উপদেশ গোপেশ মহারাজ নিজের জীবনে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। উপরি উক্ত উপদেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ঃ "এই বাক্যটি চৈতন্যদেবের শিক্ষার সারসংক্ষেপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের কৃপালাভের আশায় যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে ভজনে মনোনিবেশ করতে চান, এটি তাঁদের রক্ষাকবচ।"

মহারাজকে যাঁরা অন্তত কিছুদিনের জন্যও কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গ করেছেন—তাঁরা আশা করি একমত হবেন যে, তাঁর সাধুজীবন সর্বতোভাবে ত্যাগ-বৈরাগ্যের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। দীর্ঘকাল দিবারাত্র তাঁর কাছে থেকে কখনোই তাঁকে কোন ভাল খাওয়া-পরার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখিনি। আমরা সংসারের সব সুখভোগ ত্যাগ করে সাধু হতে এসেও অনেকসময় পছন্দমতো জিনিস না পেয়ে মন খারাপ করি। কখনো নিরুপায় বা বাধ্য হয়েই মনকে কিছু পাওয়া থেকে কষ্টে নিবৃত্ত করি। তাও হয়তো মনের গভীরে একটা চাপা আপশোস থেকেই যায়। অপরদিকে, মহারাজের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বিবেক-বৈরাগ্যপ্রসূত ত্যাগ। জিজ্ঞাসা না করলে খাবার সম্বন্ধে তিনি কোনদিন কোন মন্তব্যই করতেন না। কোন খাবার ভাল হয়েছে বলে দ্বিতীয়বার চেয়ে নিতে কিংবা পরিমাণে বেশি খেতে কোনদিন দেখিনি। খাবারের মান সংক্রান্ত সমালোচনা করার জন্য আমাকে বহু-বার তাঁর তিরস্কার শুনতে হয়েছে। ভাগবতের "জিতং সর্বং জিতে রসে" এবং গীতার "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।/ কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।।" (১৬।২১)—এই শ্লোকদুটি বহুবার বহু সাধু-ব্রহ্মচারীকে তিনি বলেছেন।

মহারাজের খাওয়া সারাদিনে তিনবার—সকালে, দুপুরে এবং রাত্রে। এই রুটিনের কখনো এদিক-ওদিক হতো না। অন্য সময়ে কেউ কিছু নিয়ে এলে খাওয়া তো দূরের কথা, পরীক্ষা করাও চলবে না। এমনকী প্রসাদ নিয়ে এলেও বলতেনঃ "মাথায় স্পর্শ করে রেখে দাও, খাওয়ার সময় দিও।" সকালে দেড় পোয়া দুধ, সঙ্গে রাস্ক বিস্কুট অথবা চা-চামচের চার-পাঁচ চামচ মুড়ির গুঁড়ো বা কর্নফ্লেক্স এবং থাকলে একটি কলা—ছোট ছোট করে কেটে দুধে দিয়ে খেতেন। গরমের সময় কাঁচা দুধে যব ও ছোলার ছাতু মিশিয়ে খেতেন। আমি যখন মঠে যোগ দিই, মহারাজ তখনো দুপুরের পঙ্গাতে খেতে আসতেন। পঙ্গাতে বেশ কিছুদিন (বছর খানেক হবে) তাঁর পাশেই খেতে বসতাম। ঘণ্টা পড়লে তিনি ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে এসে বসতেন। পায়ে বাতের ব্যথা ছিল। ডান পা-টি একটু বেঁকে গিয়েছিল হাঁটুর কাছে, তাই টেনে টেনে চলতেন। আসতে একটু দেরি হলে, এসে কখনো কখনো বলতেনঃ "আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তোমরা শুরু করে দাও। আমি বুড়ো মানুষ, আস্তে ধীরে আসি—দেরি হয়ে যায়।" অবশ্য কদাচিৎ তাঁর আসতে দেরি হতো, আর দেরি হলে সাধুরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। ঘণ্টা পড়লে একটি বহু পুরনো পেতলের বাটি—ভিতরটা কলাই করা এবং দু-চার জায়গায় ঝালাই করা—হাতে করে নিয়ে আসতেন। তাঁর কাছে শুনেছিলাম, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে থাকাকালীন কেউ তাঁকে এটি দিয়েছিলেন—প্রায় তিন পোয়া সাইজের। এসে পঙ্গাতে তাঁর জন্য যে-থালা দেওয়া থাকত, তিনি সেই থালার ওপরে তাঁর বাটিটি নিয়ে বসতেন। যাকিছু পরিবেশন করা হতো, তিনি সব তাঁর ঐ বাটিতে একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে খেতেন। থালায় কিছুই নিতেন না। তাঁর জন্য আলাদা করে কিছু করতে দেখিনি। খাওয়া হয়ে গেলে নিজের হাতে ঐ বাটি ধুয়ে ঘরে এনে শুকনো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মুছে উপুড় করে রাখতেন। উপুড় করে রাখার সময় বাটিটার একদিক একটু উঁচু করে রাখতেন। বলতেনঃ "এতে হাওয়া চলাচল করবে, বাটির ভেতরে আঁশটে গন্ধ হবে না।" তিনি বরাবরই নিরামিষ আহার করেছেন, কারণ গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে তাঁর জন্ম। জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে থাকাকালীন তিনি কদাচিৎ কখনো মাছ খেয়েছেন। বাটিটা কেউ ধুতে চাইলেও দিতেন না, বলতেনঃ "হ্যাঁ, তোমাদের ধুতে দিই, আর দুদিনেই আমার বাটিটার কলাই তুলে দাও!" আমার ধারণা, তিনি কারোর সেবা গ্রহণ করবেন না বলে বাটিটা কাউকে ধুতে দিতেন না। এরপর যখন আর পঙ্গাতে আসা সম্ভব ছিল না, তখন ঘরে বসেই খেতেন। শারীরিক অক্ষমতার জন্য এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মঠ কিছুটা দূরে নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ায় আর পঙ্গাতে খেতে আসা সম্ভব ছিল না। প্রথম প্রথম পঙ্গাতে যেমন খেতেন, তেমনি করে সবমিলিয়ে একটা বাটিতে দেওয়া হতো, তিনি চামচ দিয়ে তুলে তা খেতেন। পরে শরীর আরো অপটু হলে ভাত-ডাল-তরকারি সব মিশিয়ে মেসিনে দিয়ে মাখনের মতো নরম করে দেওয়া হতো। তিনি গুণে গুণে চা-চামচের দশ চামচ খেতেন। আমরা খাইয়ে দিলে মহারাজ গুণতেন, দশ চামচ হলেই মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলতেনঃ "আর খাব না।" এক চামচ বেশি খাওয়ার জন্য জোর করলে বাচ্চাদের মতো শুয়ে পড়তে চাইতেন। বিছানার ওপর বসে সামনে ছোট টেবিলে খাবার রেখে খেতেন। দুপুরে দশ চামচ ভাত-ডাল-তরকারি ছাড়া দেড় পোয়া দুধ এবং সেইসঙ্গে ছোট কাপের এক কাপ কমলালেবু, মোসম্বি কিংবা বেদানার রস খেতেন। প্রসাদি পায়েস এক চামচ ঐ দুধে মেশানো থাকত। তাঁর ধারণা, বেদানায় প্রচুর iron থাকে, তা খেলে রক্তে hæmoglobin বাড়ে। ৯০ বছরের ওপর যখন তাঁর বয়স, তখন তাঁর রক্তে hæmoglobin 14.5%-এর কাছাকাছি থাকত। কোন্ খাদ্যের কী গুণ সর্বদাই বলে দিতেন। রাত্রে ডালে ফেলে সিদ্ধ করা ছোট ছোট করে কাটা আট-দশ টুকরো কুমড়ো বা পেঁপে এবং সেইসঙ্গে ডালের পাতলা জল ছোট কাপের এক কাপ খেতেন। এছাড়া রাত্রে এক পোয়া দুধ খেতেন। তিনবেলাই সামান্য মিষ্টি প্রসাদ, একটি সন্দেশের এক-চতুর্থাংশ—এইসব দিয়ে খাওয়া শুরু করতেন। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য বেলের বড়ি বা মোরব্বা সকালে খেতেন। এই ছিল তাঁর সারাদিনের আহার। বছরের ৩৬৫ দিন তিনি একই ধরাবাঁধা নিয়মে একই খাবার খেতেন। তবু মাত্র জীবনধারণের জন্যই যেন খেতেন, আর কিছুর জন্য নয়। খাওয়ার প্রতি তিনি যে অযত্ন করতেন তা কখনোই মনে হয়নি; পরন্তু মনে হতো, লোভের বশে বেশি খেয়ে কিংবা emotionally কম খেয়ে শরীরকে কষ্ট দেওয়া—কোনটাই তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর খাওয়াতে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না, তবে টক-ঝাল-তেতো কিংবা তেল-মশলা বেশি হলে খেতে কষ্ট হতো, তাই খেতে চাইতেন না। মিষ্টি খুব কম পরিমাণে খেতেন, তবে আশ্রমে তৈরি হলে, তা থেকে কিছুটা ভেঙে খেতেন। আমাদেরও মিষ্টি কম করে খেতে বলতেন। ব্রহ্মচারীদের কাউকে কাউকে তিনি একেবারেই মিষ্টি খেতে নিষেধ করেছিলেন। একজন ব্রহ্মচারী একটু

মুখচোরা প্রকৃতির হওয়ায় পঙ্গাতে প্রায়ই তাকে জোর করে বেশি মিষ্টি দেওয়া হতো। ব্রহ্মচারী ফেলতে পারত না, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই তা খেয়ে নিতো। একদিন দুঃখ করে সে মহারাজকে জানালে মহারাজ তাকে বলেন ঃ "অত দুর্বল মনের হলে সাধু হবে কী করে? দিতে নিষেধ করবে, তাতে যদি না শোনে—দু-চারদিন সব ফেলে দিয়ে উঠে যেও, দেখবে তখন আর জোর করে দেবে না।" ব্রহ্মচারীটি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তদ্রূপ আচরণ করার পরে কেউ আর তাকে কোনকিছু খাওয়ার জন্য জোর করত না। সম্ভবত, ছানার মালপো, লবঙ্গলতিকা, বালুসাই, রাধাবল্লভি—এসব মহারাজ পছন্দ করতেন। কারণ, ভক্তদের কেউ কখনো সাধুভাণ্ডারা বা ঠাকুরের বিশেষ ভোগের জন্য টাকা পাঠালে তিনি এইসব মিষ্টি করতে বলতেন।

[ক্রমশ]

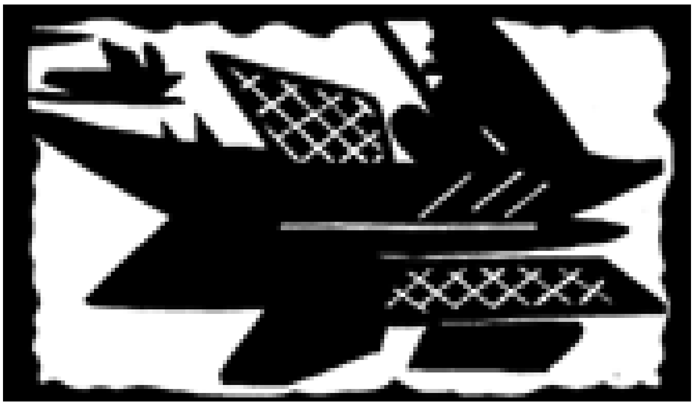

শিল্পীঃ নন্দলাল বসু

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ অধ্যক্ষ

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সম্পর্কিত দুটি সদ্য-প্রকাশিত পুস্তক

প্রথম পুস্তক ঃ স্বামী গহনানন্দ মূল্য ঃ ৫ টাকা

শিবজ্ঞানে জীবসেবায় নিবেদিতপ্রাণ, বরেণ্য সন্ন্যাসীর নিষ্ঠার সহিত ধ্যান-জপ ও কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত প্রেরণাদায়ক আলেখ্য।

দ্বিতীয় পুস্তক ঃ যুগবাণীর আলোকে মূল্য ঃ ২৫ টাকা

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের বারোটি মনোজ্ঞ আলোচনার সঙ্কলন-পুস্তক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবী ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ—এই ত্রয়ীর যুগবাণীর আলোকে কীভাবে একালের ব্যষ্টিজীবন ও সমাজজীবনের সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব, সেবিষয়ে আলোচনা রয়েছে মনন-সমৃদ্ধ এই ছোট্ট পুস্তকটিতে।

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত নতুন গ্রন্থ

মহৎ-জীবনে পরমসত্যের আভাসিত আলো মূল্য ঃ ৫০ টাকা

রচনা ঃ স্বামী তথাগতানন্দ ■ ভাষান্তর ঃ অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান

Udbodhan Office

1 Udbodhan Lane, Bagbazar, Kolkata-3, Phone : 2554-2248 Web-site : www.udbodhan.org